বাংলাদেশের যন্ত্র-নির্মাণ সমস্যা : ধোলাইখালের যন্ত্র-নির্মাতাদের মতামত

আশরাফ আলী

১ - অবতারণা

আমরা অন্যত্র বলেছি, ধোলাইখাল মালিক সমিতির সাথে বিডিআই-এর যোগযোগ আকস্মিক বা দৈবিক কোন ঘটনা নয়। বিডিআই সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক কারণে বাংলাদেশে যন্ত্র-নির্মাণের অবস্থান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় এবং ধোলাইখাল মালিক সমিতির সাথে যোগাযোগ করে। স্বদেশী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের ধারণা বাংলাদেশে যন্ত্র-নির্মাণের উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষমতা নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। আসলে বাংলাদেশে যন্ত্র-নির্মাণ কলা-কৌশল একটি চৌমাথায় এসে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা অন্য আরেকটি নিবন্ধে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উভয় সেক্টরে যেসব যন্ত্র-নির্মাণ ক্ষমতা অবহেলিত অবস্থায় অস্তিত্বশীল রয়েছে তার বর্ণনা দেবার চেষ্ঠা করবো। আজকের আলোচনা ধোলাইখালের যন্ত্র-নির্মাণ সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে সীমিত রাখা হবে।

এই নিবন্ধে বেসরকারী উদ্যোগে যন্ত্র-নির্মাণ সমস্যা সম্পর্কে ধোলাইখাল মালিক সমিতির প্রকাশিত মতামত ও উন্নয়নসম্পর্কিত ধারণা সংক্ষেপে পেশ করা হবে। প্রথমে মালিক সমিতির দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ দেওয়া হবে। মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ সমস্যা সমাধানের যে-উপায় ('সাব-কন্ট্রাক্টিং' উৎপাদন পদ্ধতি) বাতলিয়ে দিয়েছিলেন সেটিও এখানে উপস্থাপন করা হবে। নিবন্ধটির শেষে আমরা কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গতিপূর্ণ উপসংহার টানার চেষ্টা করবো।

২ - ধোলাইখাল সমিতির বিশ্লেষণ ও সাব-কন্ট্রাক্টিং পদ্ধতি

তিন নম্বর নিবন্ধে ধোলাইখাল মালিক সমিতির কাছে নিবেদিত বিডিআই-এর 'সাজেশান'গুলি তুলে ধরা হয়েছিল। ঐ সুপারিশগুলি সামনে রেখে ঢাকা জেলা ধোলাইখাল ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করে। নীচে মালিক সমিতির ব্যাখ্যা ও সম্ভাব্য সমাধানের পথ নিয়ে আলোচনা করা হলো। এ-ব্যাপারে পাঠকের কোন উপদেশ বা ধ্যান-ধারণা থাকলে আমরা তা জানতে চাই।

ক) ইতিহাস ও পটভূমিকা :- বাংলাদেশ শিল্প উন্নয়নে পৃথিবীর যে-কোন দেশের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। এর ঐতিহাসিক কারণ আমাদের অজানা নয়। বৃটিশদের নিকট থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই দেশের শিল্প কারখানা যা-কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার অধিকাংশই বৃহদাকারের শিল্প কারখানা। অবাংগালী পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকগণই ছিলেন এই সমস্ত শিল্প-কারখানার মালিক। কাঁচামাল হিসাবে পাট বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এই পাট দিয়েই চটের বস্তা এবং অন্যান্য পণ্যাদি উৎপাদন করার জন্যই পাটকলগুলি স্থাপন করা হয়েছিল।

এই সমস্ত শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত মেশিনারী বিদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হতো। টেক্সটাইল মিলের লুম এবং অন্যান্য মেশিনারীও একই উপায়ে বিদেশ থেকে অথবা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হতো। এ দেশে যে চিনিকলগুলি ছিল তাও

বিদেশীদের। এই কারখানাগুলিতে যে-সমস্ত যন্ত্রাংশ প্রয়োজন হতো তার অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হতো।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামে কয়েকটি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ছাড়া মেটাল জাতীয় পণ্যাদি উৎপাদনের তেমন কোন কারখানা ছিল না। ঐ সমস্ত শিল্প কারখানারও অধিকাংশ মালিকগণ ভারত থেকে আগত অবাংগালীরা ছিলেন। ঐ সমস্ত শিল্প কারখানায় কর্মরত বাংগালী শ্রমিকগণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন প্রকার সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকেই নিজস্ব প্রচেষ্টায় এবং অল্প পুঁজি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ধোলাইখাল এলাকায় স্থাপন করেন।

এই সমস্ত শিল্প কারখানাগুলি খুবই পুরাতন প্রযুক্তির মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছিল। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে তাঁদের তেমন কোন ধারণাই ছিল না। সরকারী কর্মকর্তা বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কারখানাগুলির ব্যাপারে কোন প্রকার খোঁজ-খবর রাখেন নাই এবং কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেন নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডি, জি, ইণ্ডাস্ট্রিজ থেকে শত শত ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয় যেসব কারখানার কোন অস্তিত্বই ছিল না। কাঁচামাল হিসাবে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানীর জন্য রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত শিল্প কারখানাগুলিকে ডি, জি, ইণ্ডাস্ট্রিজ থেকে লাইসেন্স প্রদান করা হতো। উক্ত লাইসেন্সের অধীনে বিভিন্ন কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানী ক'রে খোলা বাজারে বিক্রয় করা ছিল এই সমস্ত ব্রিফকেসধারী কারখানার মালিকদের একমাত্র কাজ।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম ধোলাইখাল এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা পরিদর্শন করতে আসেন। অভাব অভিযোগ এবং বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি খোঁজ খবর নেন এবং এই সমস্ত কারখানার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেই সময় থেকেই ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি সরকারী পর্যায়ে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা পেতে থাকে। বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

বর্তমানে ধোলাইখাল এলাকায় প্রায় ৭/৮ শত ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এই কারখানাগুলির উন্নতিকল্পেই কারখানা মালিক সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিটি সরকার অনুমোদিত ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার প্রতিনিধিত্বকারী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির ১২ (বার) জন সদস্যকে সরকার ১৯৯২ সনে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের খরচে ''অটোমোবাইল এণ্ড এগ্রিকালচারাল মেশিনারী ফর বাংলাদেশ'' শীর্ষক ষ্টাডি মিশনে জাপান ও থাইল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। জাপান ও থাইল্যাণ্ডের এই ষ্টাডি মিশনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি এবং পণ্যাদি উৎপাদনের কলা-কৌশল সম্বন্ধে সমিতির সদস্যগণ ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন।

খ) সাব-কন্ট্রাক্টিং উৎপাদন পদ্ধতি :- মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ তিন নম্বর নিবন্ধে উল্লেখিত 'গোটা যন্ত্র' ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিকে সাব-কন্ট্রাক্টিং পদ্ধতি হিসাবে অভিহিত করেন এবং বলেন, এই পদ্ধতি ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার উন্নতি করা সম্ভব নয়। সে-কারণেই সমিতির ২১টি শিল্প কারখানা একত্রিত হয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে। মেটাল জাতীয় বিভিন্ন ধরণের পণ্যাদি উৎপাদনে এই কনসোর্টিয়াম ইতিমধ্যেই বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ বিডিআই প্রস্তাবিত 'গোটা যন্ত্র' বা সাব-কন্ট্রাক্টিং যন্ত্র উৎপাদন পদ্ধতির কার্যকারিতা উপলব্ধি ক'রে বলেন, এই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা আজ প্রায় ধ্বংস হওয়ার সম্মুখীন হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। যান্ত্রিক উপায়ে চাষাবাদ করতে পারলেই চাহিদা মাফিক কৃষি পণ্যাদি উৎপাদন করা সম্ভব। এখনও প্রায় ৮০% ভাগ চাষাবাদ পুরাতন কায়দায় অবৈজ্ঞানিক নিয়মেই পরিচালিত হয়ে আসছে। কৃষি কাজের জন্য সেচ ও জমি চাষ অতীব

প্রয়োজন। এই সমস্ত সেচ ও জমি চাষের জন্য এক-সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় এবং চাষাবাদের জন্যও একই ধরণের ইঞ্জিন দ্বারা চালিত ট্রাকটর ব্যবহৃত হয়। এই এক-সিলিণ্ডার ইঞ্জিন দেশীয় নৌকায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

এক-সিলিণ্ডার ইঞ্জিনের প্রায় ৮০% যন্ত্রাংশ ধোলাইখাল এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শিল্প কারখানায় প্রস্তুত হচ্ছে। যেহেতু ইঞ্জিন তৈরী করার কোন কারখানা বেসরকারী পর্যায়ে নেই, তাই সম্পূর্ণ ইঞ্জিন বাংলাদেশে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ১০-১২ হাজার এক-সিলিণ্ডার ইঞ্জিন প্রয়োজন যার অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে ইঞ্জিন প্রস্তুত করলে প্রতিটি ইঞ্জিন প্রস্তুতের খরচ হবে ৮,৪০০ টাকা - যা ১০% মুনাফায় বিক্রয় করলে বিক্রয়মূল্য হবে ৯,২৪০ টাকা। অথচ চীন থেকে এই সমস্ত ইঞ্জিনের অধিকাংশই আমদানী হচ্ছে যার বিক্রয়মূল্য ১৪,২০০ টাকা (১৯৯৩ সনের টাকার মূল্য ধরে হিসাব করা হয়েছে)।

মালিক সমিতির হিসাব মতে ১০,০০০ ইউনিট ইঞ্জিন তৈরী করতে হলে ২৫০টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার প্রয়োজন হবে এবং প্রতিটি কারখানায় ৮ জন করে শ্রমিকের প্রতি শিফটের প্রয়োজন। সেই হিসাবে কমপক্ষে ৪,০০০ জন শ্রমিক ২ শিফটে কাজ করতে পারবে এবং প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে একশত বিশ কোটি টাকা খরচ করে যে-ইঞ্জিন আমদানী করতে হয় সেই ক্ষেত্রে মাত্র ২০-২৫ কোটি টাকার কাঁচামাল আমদানী করলেই প্রতি বৎসর প্রায় একশত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হওয়া সম্ভব।

গ) পুঁজি সমস্যা :- প্রাথমিকভাবে বৎসরে ২ হাজারটি ইঞ্জিন উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলে দেশের যে-সমস্ত সুবিধাদি রয়েছে সেগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে মাত্র ৪০-৫০ লক্ষ টাকা পুঁজির মাধ্যমেই তা সম্ভবপর। এই ধরণের ইঞ্জিন উৎপাদনে প্রাথমিক গবেষণায় মাত্র ৪/৫ লক্ষ টাকা খরচ করলেই ইঞ্জিন প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে এই লাভজনক ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার মালিকগণ উৎসাহ বোধ করবেন এবং তাদের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা যাবে।

মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ মনে করেন, সরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ করলেও মূলধনের ব্যবস্থা হতে পারে। তাঁরা আরো বলেন, কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত কোন বাংগালী কোন ব্যাপারে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করেন না। সমিতির মাধ্যমে এক-সিলিণ্ডার ইজিন প্রস্তুতের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৪/৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করার জন্য সদস্যদের নিকট বহুবার প্রস্তাব করেও কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় নি। তাছাড়া গবেষণামূলক কাজের জন্য সরকারী পর্যায় থেকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা নাই।

তাই এই ইঞ্জিন প্রস্তুতের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তা বেশ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর আর্থিক অনটনের কারণে অগ্রসর হতে পারে নি। মালিক সমিতির কর্মকর্তারা আশা করেন, তাঁদের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এই ব্যাপারে বিডিআই অথবা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান একটু উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কর্মকর্তারা এ-ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিলম্ব হলেও এই ধরণের উদ্যোগের ফলেই বাংলাদেশ শিল্প ও কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে বলে তাঁরা মনে করেন।

৩ - শেষের কথা

ধোলাইখাল মালিক সমিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবের গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। স্বদেশে সম্পূর্ণ ইঞ্জিন নির্মাণ করার ক্ষমতা অর্জন করাটা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এছাড়া স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শিল্পের সাথে কৃষির প্রত্যক্ষ সম্পর্কটি মালিক

সমিতির সদস্যগণ খুব ভালভাবে অবগত আছেন। এই সম্পর্কটি সবার ঠিক মতো বোঝা দরকার। অনেকে ভুল বুঝেন এই ভেবে যে, বাংলাদেশ যেহেতু কৃষি-প্রধান দেশ তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে শিল্পায়নকে পাশ কাটিয়ে কৃষিতে বিপ্লব আনতে হবে। আসল কথা হলো : শিল্পায়ন ছাড়া কৃষি-বিপ্লব সম্ভব নয়। কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে যে-মাত্রায় উৎপাদনশীলতা বাড়ানো দরকার তা কৃষির ব্যাপক যান্ত্রীকীকরণ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই কৃষি-বিপ্লব ঘটানোর খাতিরে বাংলাদেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটানোর প্রয়োজন।

লক্ষ্য করুন, উনিশ শো নব্বুই দশকের প্রথমার্ধেই ধোলাইখালের যন্ত্র নির্মাতারা এক-সিলিণ্ডার ইঞ্জিনের শতকরা ৮০ ভাগ যন্ত্রাংশ নির্মাণে সক্ষম ছিলেন। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ কাজ শেষ করে পুরো ইঞ্জিন নির্মাণ করা ধোলাইখালের কারিগরদের জন্য তেমন কঠিন কোন সমস্যা নয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইঞ্জিনের গুণগতমান চীন দেশে নির্মিত ইঞ্জিনের তুলনায় নিকৃষ্ট হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। ফলে স্থানীয়ভাবে নির্মিত ইঞ্জিনের দাম ৯,২৪০ টাকা হলেও ক্রেতারা খুব সম্ভবতঃ ১৪,২০০ টাকা দিয়ে চীনা ইঞ্জিন কিনবে। তাই পুরো ইঞ্জিন নির্মাণ সম্পূর্ণ করলেও বাংলাদেশে তার বাজার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না এবং বাজারের অভাবে এই প্রকল্প ব্যর্থ হবে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পণ্য উৎপাদনের আগে পণ্যের বাজার নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং এর জন্য দরকার সংশ্লিষ্ট শুল্ক কাঠামোকে সংস্কার করা। বাংলাদেশের বর্তমান শুল্ক কাঠামো সম্পূর্ণ অন্যায্য। দেখা যাবে চীনা ইঞ্জিন আমদানীর উপর নামমাত্র শুল্ক (৫% এর কাছাকাছি) বসানো হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণভাবে ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদানের উপর অন্যায্যভাবে চড়া (৫০% থেকে ১৫০%) শুল্ক লাগানো আছে। যন্ত্র আমদানী এবং কাঁচামাল/উপাদান উভয়ের উপর ১০% এর মতো ন্যায্য শুল্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারলে স্থানীয়ভাবে নির্মিত প্রতি ইউনিট ইঞ্জিনের দাম ৫,০০০ টাকা এবং চীনা ইঞ্জিনের দাম ১৫,০০০ টাকার কাছাকাছি চলে যেতে পারে। তাতে করে ক্রেতাগণ ১৫,০০০ টাকা দিয়ে চীনা ইঞ্জিন না কিনে একই টাকায় তিন ইউনিট বাংলাদেশী ইঞ্জিন কিনতে আগ্রহী হবেন।

এখানে একটি উদাহরণ খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। মালয়েশিয়ার মহাথির মোহাম্মদ উনিশ শো আশি দশকের শুরুতে স্বদেশী মোটর গাড়ী 'প্রোটন সাগা'কে কেন্দ্র করে তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিযান শুরু করেন। তিনি আমদানীকৃত বিদেশী গাড়ীর উপর ১৪০% থেকে ৩০০% শুল্ক বসিয়ে দেন যাতে বিদেশী গাড়ী সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। প্রোটন সাগা গাড়ীর সফলতা/বিফলতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা যত কথাই বলুক না কেন মহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন।

ঐ ধরণের 'প্রোটেকশানিস্ট' শুল্ক বসিয়ে তিনি অতি-জাতীয়তাবাদী নীতির পথ অনুসরণ করেছেন। মহাথির মোহাম্মদ ছিলেন সত্যিকার অর্থে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক। বাংলাদেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নামের সাথে 'জাতীয়তাবাদী' শব্দ লাগানো থাকার পরও আজ পর্যন্ত আমরা একজন সত্যিকার জাতীয়তাবাদী নেতা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের হিসাবমতে অতি-জাতীয়তাবাদী 'প্রোটেকশানিস্ট' নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং একটি ন্যায্য শুল্ক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করলেই যথেষ্ট হবে। মুক্ত-বাজার অর্থনীতির নিজস্ব গতি বাকিটা আপনা আপনিই পথে এনে ফেলবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যায়, মহাথির মোহাম্মদের মতো 'প্রোটেকশানিস্ট' হারে শুল্ক বসিয়ে দিলে চীনা ইঞ্জিনের দাম ৩৫,০০০ থেকে ৫৬,০০০ টাকায় গিয়ে দাঁড়াতো এবং বাংলাদেশী ক্রেতা নিঃসন্দেহে স্বদেশী ইঞ্জিন ক্রয় করতো। এভাবে বাজার হাতে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, স্বদেশী নির্মাতারা পণ্য বিক্রয় থেকে অর্জিত টাকার অংশবিশেষ আরএণ্ডডি-তে বিনিয়োগ করে পণ্যের গুণাগুণ বাড়াতে তৎপর হবেন। আমরা অন্য নিবন্ধে বলেছি এবং এখানে আবার বলছি, ঠিক তখনই হবে সঠিক অর্থে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রারম্ভ।